প্রধান শব্দসমূহ।
প্রজনন, নিষেক,

দশম অধ্যায়

উদ্ভিদ প্রজনন

PLANT REPRODUCTION

মাধ্যমিক শ্রেণিতে তোমরা জীবের প্রজনন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করেছ, বিশেষ করে পুষ্পক উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ, ফুলের গঠন, পরাগায়ন, গ্যামিট সৃষ্টি, নিষেক এবং ফল ও বীজ উৎপাদন বিষয়ে জেনেছ। এ অধ্যায়ে বিষয়টি আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে।
২. বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা করতে পারবে।
৩. কৃত্রিম প্রজননের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪. কৃত্রিম প্রজননের উপায় হিসেবে উদ্ভিদের সংকরায়ন বর্ণনা করতে পারবে।
৫. কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

প্রজনন জীবের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। জড় বস্তুর প্রজনন ক্ষমতা নেই। প্রতিটি জীবেরই তার অনুরূপ বংশধর সৃষ্টির প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আছে। কাঁঠালের বীজ থেকে কাঁঠাল চারা, আমের বীজ থেকে আম চারা হয় যা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে পরিপূর্ণ কাঁঠাল গাছ ও আম গাছে পরিণত হয়। একই ভাবে কলা গাছের গোড়া থেকে কলার চারা (সাকার), বাঁশ গাছের গোড়া থেকে বাঁশের চারা (সাকার) যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে পূর্ণাঙ্গ কলা গাছ ও বাঁশ গাছে পরিণত হয়। শিমুল, সজিনা, মাদার, জীয়ল ইত্যাদি গাছের ডাল কেটে মাটিতে লাগালে সেই ডাল সজীব হয়ে পরিপূর্ণ গাছে পরিণত হয়। পাথরকুচি পাতা মাটিতে ফেলে রাখলে তার কিনার থেকে নতুন পাথরকুচি চারা সৃষ্টি হয়। **মাতৃ উদ্ভিদ থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াই উদ্ভিদের প্রজনন প্রক্রিয়া।** অন্যভাবে বলা যায়, **প্রজনন একটি শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় জীব তার অনুরূপ অপত্য বংশধর সৃষ্টি করে।** এ অধ্যায়ে উদ্ভিদের প্রজনন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভ্রূণ সৃষ্টি, তার বিকাশ ও প্রকাশই উদ্ভিদের যৌন প্রজননের মূল উদ্দেশ্য। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদের ভ্রূণ সৃষ্টি ও বিকাশের বৈজ্ঞানিক আলোচনাই উদ্ভিদ ভ্রূণবিজ্ঞান বা Plant Embryology। Embryo-এর বাংলা হলো ভ্রূণ।

প্রজননের প্রকারভেদ : উদ্ভিদে বিভিন্ন উপায়ে প্রজনন হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন উপায়গুলোকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ১। যৌন প্রজনন এবং ২। অযৌন প্রজনন। ৩। এছাড়া কোনো কোনো উদ্ভিদে অন্য এক ধরনের প্রজনন দেখা যায় যা পারথেনোজেনেসিস বা অপুংজনি নামে পরিচিত।

আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌন প্রজনন

আবৃতবীজী উদ্ভিদে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় ডিম্বকে, ডিম্বক সৃষ্টি হয় ফুলের স্ত্রীকেশরের গর্ভাশয়ে। শুক্রাণু সৃষ্টি হয় পরাগরেণুতে, পরাগরেণু সৃষ্টি হয় ফুলের পুংকেশরের পরাগধানীতে। কাজেই ফুলই আবৃতবীজী উদ্ভিদে জননাঙ্গ ধারণ করে। ফুল হলো উদ্ভিদের বংশবিস্তারের (প্রজননের) জন্য বিশেষভাবে **রূপান্তরিত বিটপ (shoot)।**

১। যৌন প্রজনন (Sexual reproduction) : দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির গ্যামিটের (পুং এবং স্ত্রী গ্যামিট) মিলনের মাধ্যমে যে প্রজনন প্রক্রিয়ার সূচনা হয় তাই যৌন প্রজনন। যৌন প্রজননের মাধ্যমে সবীজী উদ্ভিদে বীজের সৃষ্টি হয়, তাই বীজ দ্বারা বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়াই যৌন প্রজনন। আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌন প্রজনন উগ্যামাস ধরনের।

রেণুস্থলী বা পরাগরেণুর পরিস্ফুটন (Development of Microsporangia) : ফুলের তৃতীয় স্তবক হলো পুংকেশর স্তবক। এক বা একাধিক পুংকেশর নিয়ে এ স্তবক গঠিত। প্রতিটি পুংকেশর নিচে দণ্ডাকার **পুংদণ্ড** (filament) এবং মাথায় স্ফীত **পরাগধানী** (anther) নিয়ে গঠিত। পরাগধানীর দুটি খণ্ডের মাঝখানে একটি **যোজনী** (connective) থাকে।

পরিণত পরাগধানী (anther) অনেকটা চারকোণাবিশিষ্ট হয়। প্রতি কোণে ভেতরের দিকে কিছু কোষ আশপাশের কোষ হতে আকারে বড় হয়। এদের ঘন সাইটোপ্লাজম এবং বড় নিউক্লিয়াস থাকে। এসব কোষকে আর্কিস্পোরিয়াল কোষ (archesporial cell) বলা হয়। এ কোষ প্রজাতিভেদে সংখ্যায় এক থেকে একাধিক থাকতে পারে। আর্কিস্পোরিয়াল কোষ বিভাজিত হয়ে পরিধির দিকে দেয়ালকোষ এবং কেন্দ্রের দিকে প্রাথমিক জননকোষে (primary sporogenous cell) পরিণত হয়। দেয়ালকোষ হতে পরে ৩–৫ স্তরবিশিষ্ট প্রাচীর গঠিত হয়। পরাগধানীর প্রাচীর ঘেরা এ অংশকে পরাগথলি (pollen sac) বলে। প্রাচীরের সবচেয়ে ভেতরের স্তর হলো ট্যাপেটাম।

প্রাথমিক জনন কোষ পরাগমাতৃকোষ হিসেবে কাজ করতে পারে অথবা বিভাজিত হয়ে অনেকগুলো পরাগমাতৃকোষে পরিণত হতে পারে। পরাগমাতৃকোষে তখন মায়োসিস (meiosis) বিভাজন হয়, ফলে প্রতিটি ডিপ্লয়েড (2n) পরাগমাতৃকোষ হতে চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) পরাগরেণুর সৃষ্টি হয়। পরাগরেণু বিভিন্ন বর্ণের হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণত হলুদ বর্ণের হয়। ট্যাপেটাম (tapetum) বিগলিত হয়ে পরিস্ফুটিত পরাগরেণুর পুষ্টি সাধন করে। পরাগমাতৃকোষ হতে সৃষ্ট চারটি পরাগরেণু বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্নভাবে সাজানো থাকে, তবে পরিণত অবস্থায় পরাগরেণুগুলো পরস্পর আলাদা হয়ে যায়। Orchidaceae, Asclepiadaceae এসব গোত্রের উদ্ভিদের পরাগরেণু পৃথক না হয়ে একসাথে থাকে। একসাথে থাকা পরাগরেণুগুলোর এ বিশেষ গঠনকে পলিনিয়াম (pollinium) বলে।

পরাগরেণুর গঠন : পরাগরেণু সাধারণত গোলাকার, ডিম্বাকার ও ত্রিভুজাকার হয় এবং এদের ব্যাস ১০ থেকে ২০০ µm পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি পরাগরেণু এককোষী, এক নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট এবং হ্যাপ্লয়েড। প্রতিটি পরাগরেণুর দুটি ত্বক থাকে। বাইরের ত্বকটি কিউটিনযুক্ত এবং পুরু। এটি বহিঃত্বক বা এক্সাইন (axine) নামে পরিচিত। এক্সাইন বিভিন্নভাবে ভার্নামেন্টেড থাকে। এক্সাইন-এ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান থাকে, প্রধান উপাদান হলো স্পোরোপোলেনিন। ভেতরের ত্বকটি

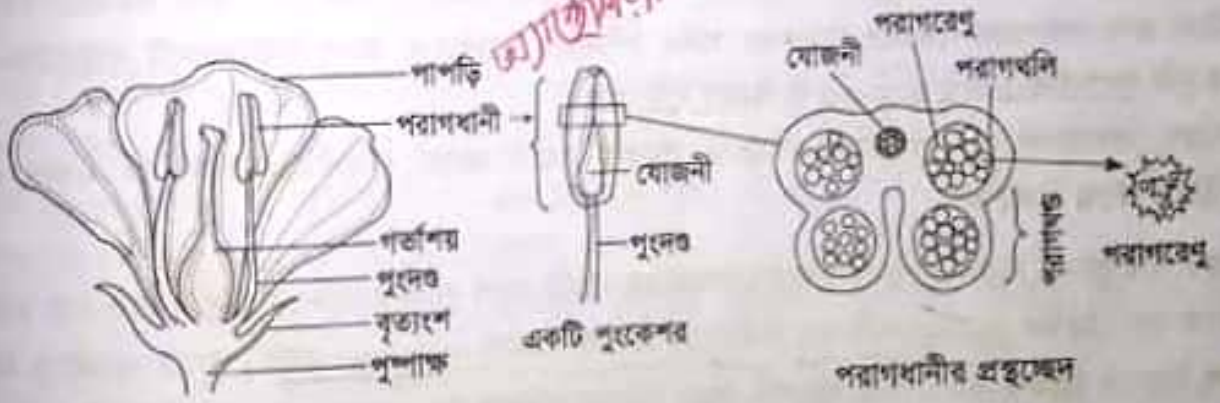

চিত্র ১০.১ : একটি পুষ্প (লম্বচ্ছেদ), একটি পুংকেশর, পরাগধানীর প্রস্থচ্ছেদ এবং একটি পরাগরেণু।

বেশ পাতলা এবং সেলুলোজ নির্মিত। এর নাম অন্তঃত্বক বা ইনটাইন (intine)। এক্সাইন (বহিঃত্বক) স্থানে স্থানে অত্যন্ত পাতলা থাকে, পাতলা ছিদ্রের ন্যায় অংশকে জনন ছিদ্র, রেণুরন্ধ্র বা জার্মপোর (germpore) বলে। একটি পরাগরেণুতে সাধারণত একাধিক জার্মপোর (২০টি পর্যন্ত) থাকে। পরাগরেণুর সাইটোপ্লাজম ঘন থাকে এবং প্রথম পর্যায়ে নিউক্লিয়াসটি মাঝখানে থাকে। পরিণত অবস্থায় কোষগহ্বর সৃষ্টির ফলে নিউক্লিয়াসটি এক দিকে সরে আসে।

পুংগ্যামিটোফাইটের বিকাশ বা পরিস্ফুটন (Development of male gametophyte) ও গঠন : পরাগরেণু(n) হলো পুংগ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ। পরাগরেণুর নিউক্লিয়াসটি বিভাজিত হয়ে দুটি অসম নিউক্লিয়াস গঠন করে। বড়টিকে বলা

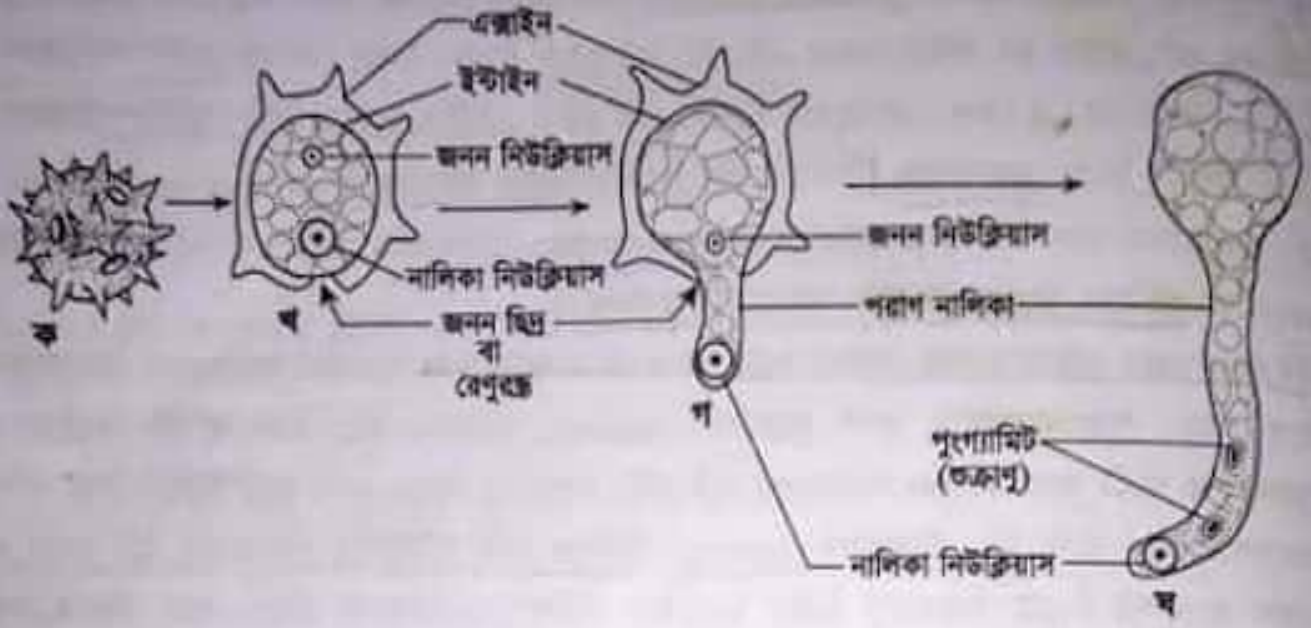

চিত্র : ১০.২: (ক) পরাগরেণু, (খ–গ) পুংগ্যামিটোফাইট সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ এবং (ঘ) পুংগ্যামিটোফাইট।

হয় **নালিকা নিউক্লিয়াস** (tube nucleus) এবং ছোটটিকে বলা হয় **জনন নিউক্লিয়াস** (generative nucleus)। পরাগধানীর প্রাচীর ফেটে গেলে সাধারণত **এই দ্বি-নিউক্লিয়াস অবস্থায় পরাগরেণু** বের হয়ে আসে এবং **পরাগায়ন** (Pollination) সংঘটিত হয়। উদ্ভিদে পরাগায়নের কারণে কোনো তরল পদার্থ (পানি) ছাড়াই নিষিক্তকরণ (fertilization) সম্ভব হয়। পরাগায়নের মাধ্যমে পরাগরেণু স্ত্রীকেশরের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় এবং অঙ্কুরিত হয় অর্থাৎ ইনটাইন বৃদ্ধি পেয়ে জার্মপোর (জননছিদ্র) দিয়ে নালিকার আকারে বাড়তে থাকে। এ নালিকাকে **পোলেন টিউব** (pollen tube) বা **পরাগনালিকা** বলে। পরাগনালিকার ভেতরে নালিকা নিউক্লিয়াস এবং পরে জনন নিউক্লিয়াস প্রবেশ করে। নালিকাটি গর্ভদণ্ডের ভেতর ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং গর্ভাশয়ের ভেতরে ডিম্বকরন্ধ্র পর্যন্ত পৌঁছায়। ইতোমধ্যে জনন নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি **পুংগ্যামিট** (male gamete) বা **শুক্রাণু** সৃষ্টি করে।

পরাগরেণু, পরাগনালিকা, পুংগ্যামিট–এগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হলো **পুংগ্যামিটোফাইট**, যা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং স্পোরোফাইটের উপর নির্ভরশীল।

ডিম্বকের পরিস্ফুটন : ডিম্বক হলো ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরস্থ একটি অংশ যা মাতৃ জননকোষ সৃষ্টি করে এবং নিষেকের পর বীজে পরিণত হয়। **ডিম্বক (ovule)** সৃষ্টি হয় গর্ভাশয়ের ভেতরে অমরা (placenta) হতে। প্রথমে অমরাতে একটি ছোট স্ফীত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়। স্ফীত অঞ্চলটি ক্রমে ডিম্বকে পরিণত হয়। প্রথম পর্যায়ে ডিম্বকের টিস্যুকে মূলত দুটি ভাগে চিহ্নিত করা যায়– চারপাশের **আবরণ** টিস্যু এবং মাঝের **নিউসেলাস** (nucellus) টিস্যু। পরবর্তী পর্যায়ে বাইরের আবরণটির নিচে আর একটি আবরণ তৈরি হয়। বাইরের আবরণটি **বহিঃত্বক** এবং ভেতরেরটি **অন্তঃত্বক** হিসেবে পরিচিত। ডিম্বকের অগ্রভাগে নিউসেলাসের একটু অংশ অনাবৃত থাকে, কারণ ত্বক এ অংশকে আবৃত করে না। এটি একটি ছিদ্রপথ বিশেষ, যাকে **মাইক্রোপাইল** (micropile) বা **ডিম্বকরন্ধ্র** বলা হয়। ডিম্বকরন্ধ্রের কাছাকাছি নিউসেলাস টিস্যুতে একটি কোষ আকারে বড় হয়। এর নিউক্লিয়াসটিও আকারে অপেক্ষাকৃত বড় থাকে এবং কোষটি ঘন সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। এ কোষকে প্রাইমারি আর্কিস্পোরিয়্যাল কোষ (primary archesporial cell) বলে। আর্কিস্পোরিয়্যাল কোষটি বিভক্ত হয়ে একটি **দেয়ালকোষ** এবং একটি **প্রাথমিক জননকোষ** (primary sporogenous cell) সৃষ্টি করতে পারে অথবা সরাসরি **গুরুরেণু মাতৃকোষ** (megaspore mother cell) হিসেবে কাজ করে।

দ্বিপ্লয়েড স্ত্রীরেণু মাতৃকোষটি মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে চারটি হ্যাপ্লয়েড স্ত্রীরেণু (megaspore) তৈরি করে। চারটি স্ত্রীরেণুর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনটি নষ্ট হয়ে যায় এবং একটি (নিচেরটি) কার্যকর হয়।

ডিম্বকের গঠন : একটি ডিম্বক (megasporangium = ovule) নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত:

চিত্র ১০.৩ : ডিম্বকের গঠন (নিম্নমুখী বা অধোমুখী ডিম্বকের লম্বচ্ছেদ)।

১। ডিম্বকনাড়ী (Funiculus) : ডিম্বকের বৃন্তের ন্যায় অংশকে ডিম্বকনাড়ী বলা হয়। এর সাহায্যে ডিম্বক অমরার সাথে সংযুক্ত থাকে। কোনো কোনো প্রজাতিতে ডিম্বকনাড়ী ডিম্বকের সাথে আংশিকভাবে যুক্ত থেকে শিরার মতো গঠন করে। এই যুক্ত অংশকে র‍্যাফি (raphe) বলে।

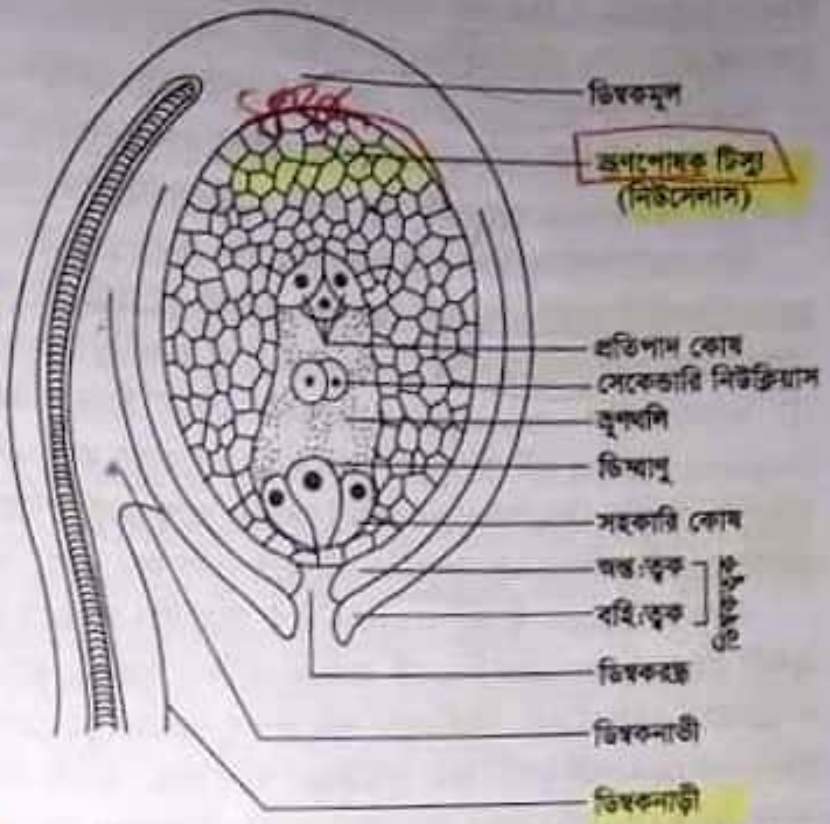

২। ডিম্বকনাভী (Hilum) : ডিম্বকের যে অংশের সাথে ডিম্বকনাড়ী সংযুক্ত থাকে তাকে ডিম্বকনাভী বলে।

৩। নিউসেলাস (Nucellus) বা ভ্রূণপোষক টিস্যু : ত্বক দিয়ে ঘেরা প্রধান টিস্যুই হলো নিউসেলাস।

৪। ডিম্বকত্বক (Integument) : নিউসেলাসের বাইরের আবরণীকেই ডিম্বকত্বক বলা হয়। সাধারণত এটি দুস্তর বিশিষ্ট।

৫। ডিম্বকরন্ধ্র (Micropyle) : ডিম্বকের অগ্রপ্রান্তে ত্বকের ছিদ্র অংশই ডিম্বকরন্ধ্র বা মাইক্রোপাইল।

৬। ডিম্বকমূল (Chalaza) : ডিম্বকের গোড়ার অংশ, যেখান থেকে ত্বকের সূচনা হয়, তাকে ডিম্বকমূল বলে।

৭। ভ্রূণথলি (Embryo sac) : নিউসেলাসের মধ্যে অবস্থিত থলির ন্যায় অংশকে ভ্রূণথলি বলে। এর ভেতরে প্রতিপাদ কোষ, ডিম্বাণু যন্ত্র ও সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস থাকে।

বিভিন্ন প্রকার ডিম্বক : ডিম্বকরন্ধ্র, ডিম্বাকনাড়ী, ডিম্বকমূল ইত্যাদি অংশের পারস্পরিক অবস্থান অনুযায়ী ডিম্বক নিম্নলিখিত প্রকার হয়ে থাকে।

১। ঊর্ধ্বমুখী (Orthotropous বা Atropous) : ঊর্ধ্বমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ উপরে থাকে। এই প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকনাড়ী, ডিম্বমূল ও ডিম্বকরন্ধ্র একই সরল রেখায় খাড়াভাবে অবস্থিত থাকে। ডিম্বকরন্ধ্র শীর্ষে এবং ডিম্বকমূল গোড়ায় অবস্থান করে। উদাহরণ : বিষকাটালী (পানি মরিচ), গোলমরিচ, পান ইত্যাদি।

চিত্র ১০.৪ : বিভিন্ন প্রকার ডিম্বকের গঠন। (ক) ঊর্ধ্বমুখী; (খ) অধোমুখী, (গ) পার্শ্বমুখী; (ঘ) বক্রমুখী।

২। অধোমুখী বা নিম্নমুখী (Anatropous) : অধোমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ নিচে থাকে। এই প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকরন্ধ্র নিচের দিকে ডিম্বকনাড়ীর কাছাকাছি থাকে, এবং ডিম্বকমূল উপরে থাকে। উদাহরণ : শিম, রেড়ি, আম ইত্যাদি। ঊর্ধ্বমুখী ও অধোমুখী একটি অপরটির বিপরীত।

৩। পার্শ্বমুখী (Amphitropous) : পার্শ্বমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ উপরে বা নিচে নয়, এক পাশে থাকে। এই ধ
ডিম্বকে ডিম্বকরন্ধ্র ও ডিম্বকমূল বিপরীতমুখী অবস্থানে দুই পাশে থাকে এবং ডিম্বকনাড়ীর সাথে সমকোণে অবস্থান ক
উদাহরণ- ক্ষুদিপানা, পপি (আফিম) ইত্যাদি।

৪। বক্রমুখী (Campylotropous) : বক্রমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ পার্শ্বমুখীর চেয়ে কিছুটা বেঁকে নিচের দিকে
করানো অবস্থায় থাকে। এই প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকমূল ডিম্বকনাড়ীর সাথে সমকোণে অবস্থিত কিন্তু ডিম্বকরন্ধ্র অঞ্চলটি
বাঁকা হয়ে ডিম্বকনাড়ীর কাছাকাছি চলে আসে। উদাহরণ- সরিষা, কালকাসুন্দা।

স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের বিকাশ বা পরিস্ফুটন (Development of female gametophyte) **ও গঠন :** স্ত্রীরেণু (megaspore)
হলো স্ত্রীগ্যামিটোফাইট-এর প্রথম কোষ। কার্যকরী স্ত্রীরেণুটি বিভাজিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে স্ত্রীগ্যামিটোফাইট গঠন করে।
স্ত্রীগ্যামিটোফাইট এমব্রিয়োস্যাক (embryo sac) বা ভ্রূণথলি নামেও পরিচিত। ভ্রূণথলির গঠন প্রধানত তিন প্রকার, যথা-
(i) মনোস্পোরিক (monosporic)–এক্ষেত্রে একটি স্ত্রীরেণু ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে; (ii) বাইস্পোরিক
(bisporic)–এক্ষেত্রে দুটি স্ত্রীরেণু ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে এবং (iii) টেট্রাস্পোরিক (tetrasporic)–এক্ষেত্রে চারটি
স্ত্রীরেণুই ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে। শতকরা প্রায় ৭৫টি উদ্ভিদেই মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় ভ্রূণথলি গঠিত হয়।
এখানে ভ্রূণথলি গঠনের মনোস্পোরিক প্রক্রিয়াই বর্ণনা করা হলো। এটি *Polygonum* ধরন হিসেবেও পরিচিত।

এক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ হতে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় চারটি হ্যাপ্লয়েড স্ত্রীরেণু গঠিত হয় যার মধ্যে উপরের
তিনটি নষ্ট হয়ে যায় এবং নিচেরটি কার্যকরী থাকে। কার্যকরী স্ত্রীরেণু নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে দুটি
নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। নিউক্লিয়াস দুটি স্ত্রীরেণু কোষের দুই মেরুতে অবস্থান করে। প্রতিটি মেরুর নিউক্লিয়াস পর পর
দুবার বিভাজিত হয়ে চারটি করে নিউক্লিয়াস গঠন করে। প্রতিটি নিউক্লিয়াস অল্প সাইটোপ্লাজম এবং হালকা প্রাচীর দিয়ে
আবৃত থাকে (কাজেই কোষও বলা যেতে পারে)। ইতোমধ্যে স্ত্রীরেণুকোষটি একটি দুইমেরু যুক্ত থলির ন্যায় অঙ্গে পরিণত
হয় এবং এর প্রতি মেরুতে ৪টি করে মোট ৮টি নিউক্লিয়াস থাকে। এ অবস্থায় প্রতি মেরু হতে একটি করে নিউক্লিয়াস
থলির মাঝখানে চলে আসে এবং পরস্পর মিলিত হয়, যাকে ফিউশন নিউক্লিয়াস বা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস (fusion
nucleus or secondary nucleus) বলা হয়।

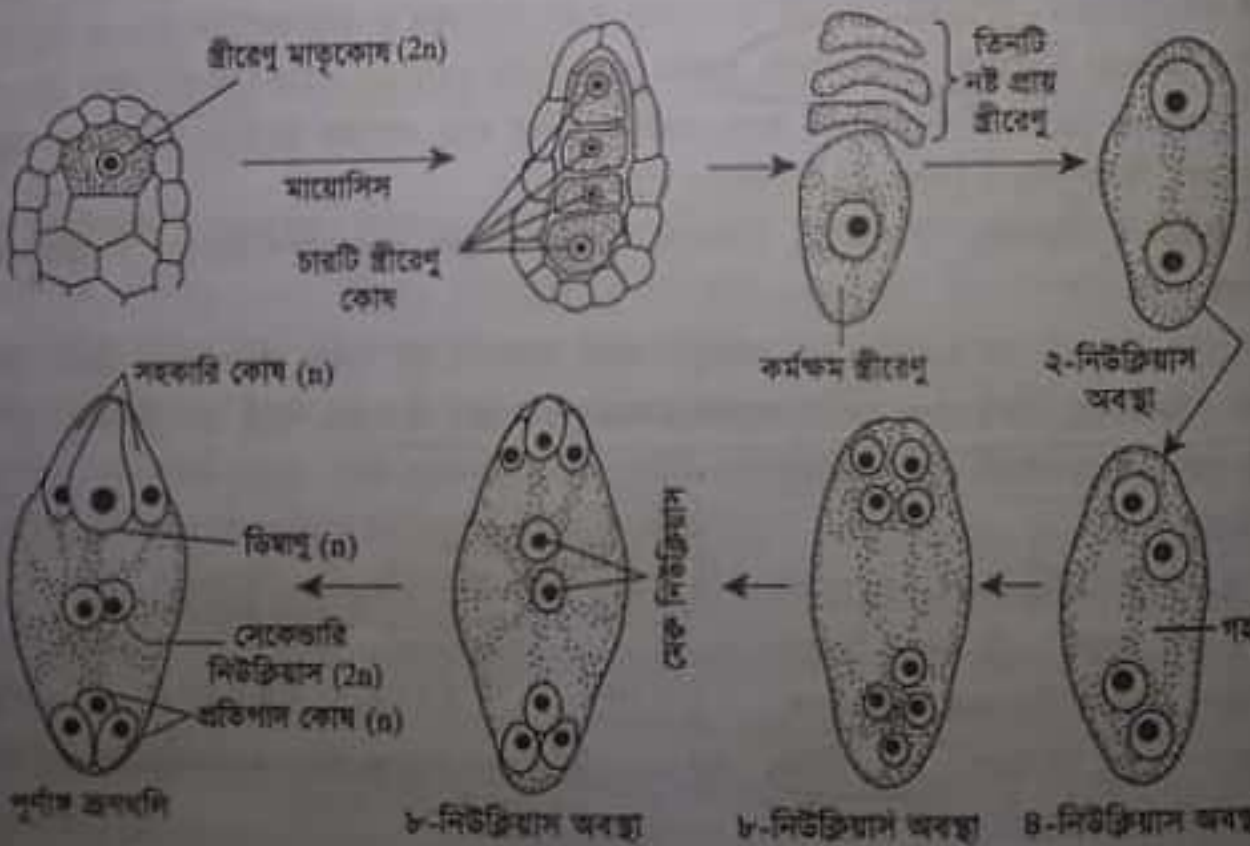

চিত্র ১০.৫ : মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের বর্ধনের বিভিন্ন ধাপ বা স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের বিকাশ।

ভ্রূণথলির যে মেরু ডিম্বকরন্ধ্রের দিকে থাকে সে মেরুর তিনটি নিউক্লিয়াসকে একত্রে এগ অ্যাপারেটাস (egg apparatus) বা ডিম্বাণু যন্ত্র বা গর্ভযন্ত্র বলে। ডিম্বাণু যন্ত্রের মাঝখানের নিউক্লিয়াসটি বড় থাকে, একে এগ, ওভাম বা উস্ফিয়ার (egg, ovum or oosphere) বলা হয়। বাংলায় একে আমরা ডিম্বাণু বলি। ডিম্বাণুর দু'পাশের দুটি নিউক্লিয়াসকে সিনারজিড (synergid) বা সাহায্যকারী নিউক্লিয়াস বা সাহায্যকারী কোষ বলা হয়। ভ্রূণথলির যে মেরু ডিম্বকমূলের দিকে থাকে সে মেরুর নিউক্লিয়াস তিনটিকে প্রতিপাদ নিউক্লিয়াস বা প্রতিপাদ কোষ বলে।

ভ্রূণথলি এবং এতে অবস্থিত ডিম্বাণু, সাহায্যকারী নিউক্লিয়াস, প্রতিপাদ নিউক্লিয়াস এবং সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসকে একত্রে স্ত্রীগ্যামিটোফাইট বলা হয়। ডিম্বকের মধ্যে স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের উৎপত্তি ঘটে। স্ত্রীগ্যামিটোফাইট স্পোরোফাইটের উপর নির্ভরশীল।

নিষেকক্রিয়া (Fertilization) : অপেক্ষাকৃত বড় ও নিশ্চল স্ত্রীগ্যামিটের (ডিম্বাণুর) সাথে ছোট ও সচল পুংগ্যামিটের (শুক্রাণুর) যৌন মিলনকে ফার্টিলাইজেশন (fertilization) তথা নিষেকক্রিয়া, নিষেক বা গর্ভাধান বলে। পরাগধানী থেকে মুক্ত পরাগরেণু বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে যখন একই প্রজাতির পুষ্পের গর্ভকেশরের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় তখন তাকে পরাগায়ন (Pollination) বলে। সকল আবৃতবীজী উদ্ভিদ ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে পরাগায়ন ঘটে থাকে।

নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়াটিকে নিম্নলিখিত উপায়ে উপস্থাপন করা যায়: (i) গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম, (ii) পরাগনালিকার গর্ভাশয়মুখী যাত্রা ও শুক্রাণু সৃষ্টি, (iii) পরাগনালিকার ভ্রূণথলিতে প্রবেশ ও শুক্রাণু নিক্ষিপ্তকরণ এবং (iv) ভ্রূণথলিতে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন।

(i) গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম : প্রথমে পরাগরেণু স্বপ্রজাতি শনাক্ত করে। গর্ভমুণ্ডের বিশেষ প্রোটিন এবং পরাগরেণুর বিশেষ প্রোটিন পারস্পরিক বিক্রিয়ায় স্বপ্রজাতি শনাক্ত করে। স্বপ্রজাতি শনাক্তকরণের পর পরাগরেণু গর্ভমুণ্ড থেকে তরল পদার্থ শোষণ করে আকারে বড় হয় এবং অঙ্কুরিত হয়। অর্থাৎ পরাগরেণুর পাতলা অভ্যন্তর প্রাচীর প্রসারিত হয়ে পরাগরন্ধ্র পথে নলাকারে বের হয়ে আসে, একে পরাগনালিকা বলে। সাধারণত স্বপ্রজাতি ছাড়া পরাগরেণু অঙ্কুরিত হয় না।

চিত্র ১০.৬ : আবৃতবীজী উদ্ভিদের নিষেকক্রিয়া।

(ii) পরাগনালিকার গর্ভাশয়মুখী যাত্রা ও শুক্রাণু সৃষ্টি : পরাগনালিকাটি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে গর্ভমুণ্ড হতে গর্ভদণ্ডের ভেতর দিয়ে গর্ভাশয় পর্যন্ত পৌঁছায় এবং গর্ভাশয়ের স্তর ভেদ করে ডিম্বক পর্যন্ত পৌঁছায়। পরাগনালিকা কর্তৃক নিঃসৃত সেলুলেজ, পেকটিনেজ ইত্যাদি এনজাইম গর্ভমুণ্ডের ভেতরের কোষ বিগলন করে অগ্রসরমান পরাগনালিকার জন্য পথ সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যে পরাগনালিকার ভেতরে অবস্থিত জনন নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি শুক্রাণু তথা পুংগ্যামিট সৃষ্টি করে। অধিকাংশ উদ্ভিদে (যেমন-ধান, আম) পরাগনালিকা ডিম্বকরন্ধ্র পথে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে porogamy বলে। কিছু কিছু উদ্ভিদে (যেমন-*Casuarina* ঝাউ) পরাগনালিকা ডিম্বকমূল দিয়ে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে chalazogamy বলে। কোনো কোনো উদ্ভিদে (যেমন-লাউ, কুমড়া) পরাগনালিকা ডিম্বকত্বক

ভেদ করে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে mesogamy বলে। সাধারণত একটি মাত্র নালিকাই ডিম্বকে প্রবেশ করে। উদ্ভিদে পোরোগ্যামি প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

(iii) পরাগনালিকার ভ্রূণথলিতে প্রবেশ ও শুক্রাণু নিষ্ক্ষিপ্তকরণ : পরাগনালিকা প্রথমে গর্ভাশয়ের গাত্র ভেদ করে প্রবেশ করে। ইতোমধ্যে ডিম্বকে অবস্থিত স্ত্রীরেণু হতে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। ডিম্বাণু ভ্রূণথলিতেই অবস্থান করে। পরাগনালিকা শেষ পর্যন্ত ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করে। মনে করা হয় কিছু বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ পরাগনালীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে। ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করে এটি সাহায্যকারী কোষের উপর দিয়ে ডিম্বাণুর নিকট পৌঁছে। পরে পরাগনালিকার অগ্র প্রসারিত হয়ে ফেটে যায় এবং শুক্রাণু তথা পুংগ্যামিট ভ্রূণথলিতে নিক্ষিপ্ত হয়। এ সময় পরাগনালিকার চাপে অন্তত একটি সাহায্যকারী কোষ ধ্বংস হয়ে যায়।

(iv) ভ্রূণথলিতে ডিম্বাণুর সাথে একটি এবং গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে একটি শুক্রাণুর মিলন : পরাগনালিকা ভ্রূণথলিতে নিক্ষিপ্ত দুটি পুংগ্যামিটের মধ্যে একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত ও একীভূত হয়ে যায় অর্থাৎ নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করে। এ প্রকার মিলনকে সিনগ্যামি (syngamy) বলে। প্রকৃতপক্ষে ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলনই হলো নিষেকক্রিয়া। অপর পুংগ্যামিটটি সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত ও একীভূত হয়। এ প্রকার মিলনকে ত্রিমিলন (triple fusion) বলে।

দ্বিনিষেকক্রিয়া বা দ্বিনিষেক (Double fertilization) : একই সময়ে ডিম্বাণুর সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলন, সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে অপর পুংগ্যামিটের মিলন প্রক্রিয়াকে দ্বিনিষেকক্রিয়া (double fertilization) বা দ্বিনিষেক প্রক্রিয়া বলে। দ্বিনিষেক আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য (নগ্নবীজী উদ্ভিদের *Ephedra*-তে দ্বিনিষেক আবিষ্কৃত হয় ১৯৯০ সালে —এটি ব্যতিক্রম)।

এ প্রক্রিয়ায় একটি পুংগ্যামিট ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় এবং অপর একটি পুংগ্যামিট সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়; ফলে ডিম্বাণু জাইগোটে পরিণত হয় এবং ডিপ্লয়েড অবস্থাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস ট্রিপ্লয়েড অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলনকে ত্রিমিলন (triple fusion) বলা হয়। এতে দুটি মেরু নিউক্লিয়াস ও একটি পুংনিউক্লিয়াস, এ তিনটি নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে।

নিষেকের পরিণতি (After effects of fertilization) : গর্ভাশয় থেকে ফল সৃষ্টি, ডিম্বক থেকে বীজ সৃষ্টি এবং উভয় হতে নতুন বংশধর সৃষ্টি হলো নিষেকের চূড়ান্ত পরিণতি। নিচে নিষেকের পরিণতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১। ভ্রূণের পরিস্ফুটন : নিষেকের ফলে অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড (n) ডিম্বাণুর সাথে হ্যাপ্লয়েড (n) শুক্রাণুর যৌন মিলনের ফলে যে ডিপ্লয়েড ($n + n = 2n$) কোষের সূচনা হয়, তাকে জাইগোট বা উস্পোর (zygote or oospore) বলে। নিষিক্ত ডিম্বক তথা জাইগোটই হলো স্পোরোফাইটের প্রথম কোষ। জাইগোট তার চারপাশে একটি প্রাচীর নিঃসৃত করে এবং কিছু সময় সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং প্রজাতি বিশেষে জাইগোটের সুপ্তিকাল ভিন্নতর হয়। সুপ্ত অবস্থা কেটে গেলে এতে মাইটোটিক বিভাজন শুরু হয়। প্রথম বিভাজন সাধারণত আড়াআড়ি (transversely) ভাবে হয়, ফলে একটি দ্বিকোষী আদিভ্রূণ (proembryo) গঠিত হয়। আদিভ্রূণটি ক্রম বিভাজন ও বিকাশের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণে পরিণত হয়।

২। সস্যের উৎপত্তি : সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের (2n) সাথে একটি শুক্রাণুর (n) মিলনের ফলে যে ট্রিপ্লয়েড (3n) এন্ডোস্পার্ম নিউক্লিয়াস গঠিত হয় তা বার বার বিভাজন ও বিকাশের মাধ্যমে সস্য বা এন্ডোস্পার্ম টিস্যু গঠন করে। এ সস্য প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উপাদান উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ থেকে এসে সস্যটিস্যু সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সস্যটিস্যু প্রচুর পরিমাণ স্টার্চ, লিপিড ও প্রোটিন জমা করে।

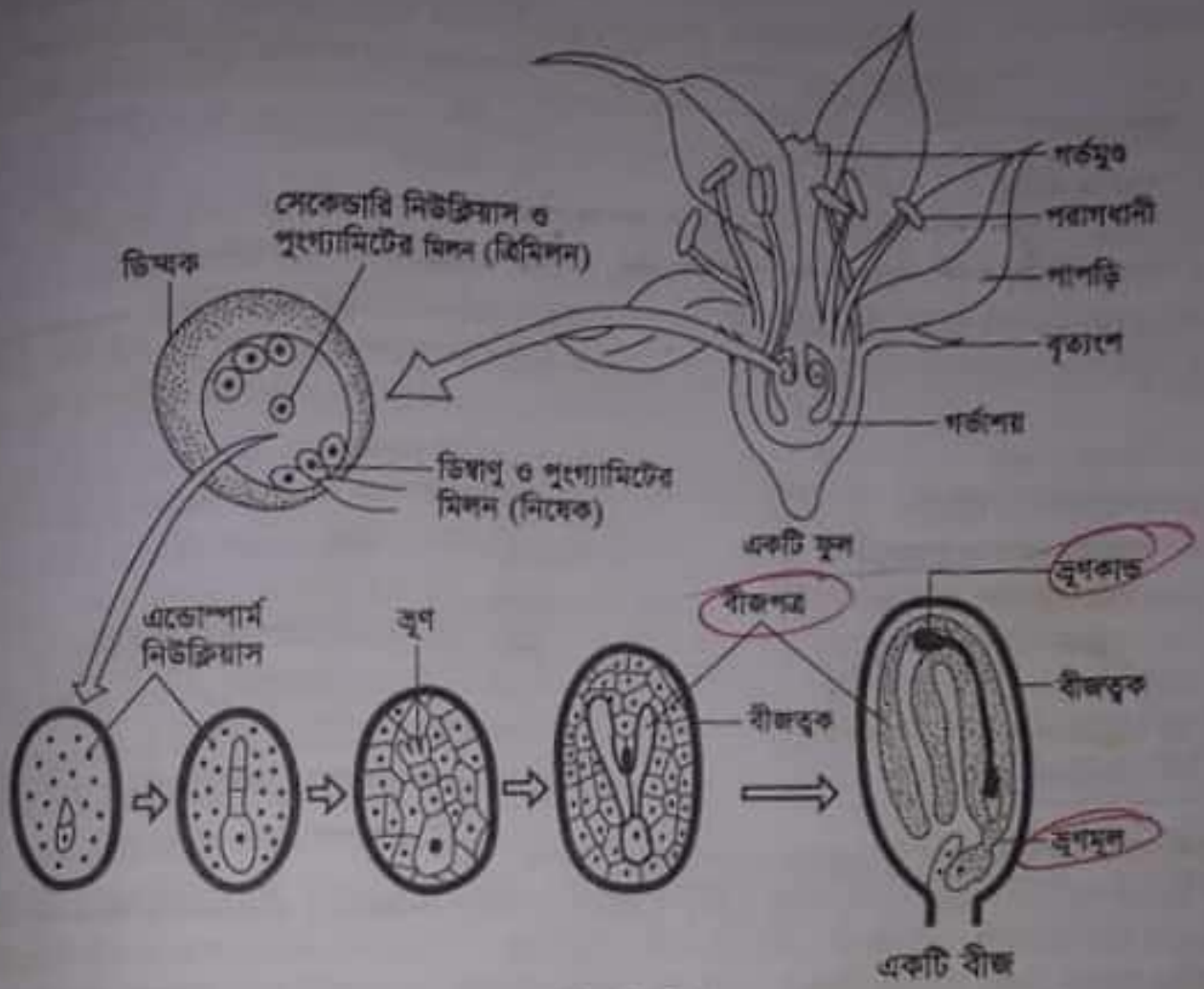

চিত্র ১০.৭ : বীজ সৃষ্টি প্রক্রিয়া।

৩। **বীজ সৃষ্টি :** ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ এবং আবৃতবীজী উদ্ভিদে বীজ সৃষ্টি হয়। নিষেকের পর বিভিন্ন ধরনের বিভাজন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে ডিম্বক (ovule) ক্রমান্বয়ে বীজে পরিণত হয়।

জাইগোটস্থ আদিভ্রূণ ক্রমবিভাজন ও পরিস্ফুটনের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত একটি ভ্রূণ গঠন করে। ভ্রূণে থাকে বীজপত্র (cotyledon), ভ্রূণকাণ্ড (plumule) ও ভ্রূণমূল (radicle)। একই সাথে সস্য বা এন্ডোস্পার্মও (endosperm) গঠিত হয়। ভ্রূণ পরিস্ফুটনের সময় ভ্রূণপোষক টিস্যু (nucellus) ভ্রূণকে পুষ্টি দান করে, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি নিঃশেষ হয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি পরিভ্রূণ (মাত্র একটি আবরণ) হিসেবে অবস্থান করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এন্ডোস্পার্মও নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, এরূপ বীজকে অসস্যাল বীজ বলে।

নিষেকের পর ডিম্বকের অভ্যন্তরে এরূপ পরিবর্তনের সাথে সাথে ডিম্বকের ত্বক দুটি অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শুষ্ক হয়ে বীজত্বকে পরিণত হয়। রসালো ডিম্বকটি পানি হারিয়ে অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শুষ্ক হয়ে বীজে পরিণত হয়। এরূপ পরিবর্তনকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বীজের একটি তৃতীয় স্তর সৃষ্টি হয়, যাকে এরিল (aril) বলে। লিচু, কাঠলিচু ও রাম্বুটানে এরূপ এরিল দেখা যায়। শাপলা বীজেও এরিল আছে। লিচু ও কাঠলিচুর এরিল হলো ভোজ্য অংশ।

প্রত্যেক নিষেকের পর ডিম্বকটি বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত বড়, শক্ত ও শুষ্ক হয়ে একটি বীজে পরিণত হয়। অঙ্কুরোদ্গমের পর বীজ হতে প্রজাতি অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ আত্মপ্রকাশ করে।

৪। **ফল সৃষ্টি :** ফল হলো রূপান্তরিত গর্ভাশয় যা নিষেকের পর বিকশিত হয়। নিষেকের ফলে গর্ভাশয় উদ্দীপ্ত হয়ে ফলে পরিণত হয়। নিষেক শেষে পুষ্পের স্তবকগুলো নিষ্প্রভ হয়ে এক সময় ঝরে পরে। গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড শুকিয়ে যায়। পরিণত পরিপক্ব হয়ে মাতৃউদ্ভিদ থেকে পৃথকও হয়ে যায়। ফলের আকার, আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে রয়েছে সীমাহীন বৈচিত্র্য। ফলটি উদ্ভিদের ফল দেখে তার উৎস-উদ্ভিদকে নিশ্চিত করা যায়। ফল বীজকে পুষ্টি দান করে এবং বিস্তারণে বিস্তারণে সাহায্য করে।

নিষেকের পর গর্ভাশয় (ডিম্বাশয়) এবং ডিম্বকের বিভিন্ন পরিবর্তন	
নিষেকের আগে	নিষেকের পরে বিকশিত হলে
১। গর্ভাশয়	১। ফল
২। গর্ভাশয় প্রাচীর	২। ফলত্বক
৩। ডিম্বক	৩। বীজ
৪। ডিম্বক বহিঃত্বক বা এক্সাইন	৪। টেস্টা (বীজ বহিঃত্বক)
৫। ডিম্বক অন্তঃত্বক বা ইন্টাইন	৫। টেগমেন (বীজ অন্তঃত্বক)
৬। নিউসেলাস বা ভ্রূণপোষক টিস্যু	৬। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃশেষ হয়ে যায়, কিছিৎ থাকলে তা পেরিস্পার্ম (পরিভ্রূণ) হয়
৭। ডিম্বাণু বা এগ	৭। ভ্রূণ (embryo)
৮। সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস	৮। এন্ডোস্পার্ম বা সস্য
৯। সহকারি কোষ বা সিনারজিড	৯। নষ্ট হয়ে যায়
১০। অ্যান্টিপোডাল বা প্রতিপাদকোষ	১০। নষ্ট হয়ে যায়
১১। মাইক্রোপাইল বা ডিম্বকরন্ধ্র	১১। বীজের মাইক্রোপাইল (বীজরন্ধ্র)
১২। হাইলাম বা ডিম্বকনাভী	১২। হাইলাম (বীজনাভী)
১৩। ফিউনিকুলাস বা ডিম্বকনাড়ী	১৩। বীজের বোঁটা (বীজবৃন্ত)
১৪। ক্যালাজা বা ডিম্বকমূল	১৪। নষ্ট হয়ে যায় (বীজমূল)

নিষেকক্রিয়ার গুরুত্ব বা তাৎপর্য (Significance of fertilization)

জীবজগতে নিষেকক্রিয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় স্ত্রীগ্যামিটের সাথে পুংগ্যামিটের মিলন ঘটে এবং গ্যামিট দুটির প্রোটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসের সংযুক্তি ঘটে। কাজেই নিষেকক্রিয়ার ফলে দুটি হ্যাপ্লয়েড গ্যামিটে মিলনের মাধ্যমে একটি ডিপ্লয়েড জাইগোট সৃষ্টি হয়। জাইগোট হতে ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। ভ্রূণের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিষিক্ত ডিম্বাণুতে প্রোটিন সংশ্লেষণ এবং বিপাকের হার বাড়াতেও নিষেকক্রিয়া সাহায্য করে। নিষেকের মাধ্যমে প্রজাতিতে জিন সংমিশ্রণ ঘটে। এর ফলে যে প্রকরণ ঘটে তা বিবর্তনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নিষেকের ফলে পুষ্পের গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে ডিম্বকগুলো বীজে পরিণত হয় এবং গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়। কাজেই দেখা যায় নিষেকক্রিয়ার ফলেই বীজ এবং ফলের সৃষ্টি হয়। বীজ উদ্ভিদের বংশ রক্ষা করে। বীজের সৃষ্টি না হলে অধিকাংশ পুষ্পক উদ্ভিদই হয়ত বিলুপ্ত হয়ে যেতো। আবার উদ্ভিদের ফল এবং বীজের উপরই খাদ্যের জন্য প্রাণিকুল, বিশেষ করে মানুষ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কাজেই নিষেকক্রিয়া যত না গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদকুলের জন্য, তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ জাতির জন্য। আমরা আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, বেল, পেঁপে, ধান, গম, বার্লি, ভুট্টা ইত্যাদি যা খেয়ে থাকি তা সবই নিষেকক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। আবার নিষেকক্রিয়া না ঘটলে উদ্ভিদসমূহ হ্যাপ্লয়েড অবস্থা হতে পুনরায় ডিপ্লয়েড অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না। ফলে প্রজাতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে যেত। তাই নিষেকক্রিয়ার তাৎপর্য অপরিসীম।

যৌন প্রজননের সুফল

১। যৌন প্রজননের ফলে রিকম্বিনেশনের মাধ্যমে জেনেটিক ভাইভার্সিটি তৈরি হয়।

২। জেনেটিক ভাইভার্সিটির কারণে উদ্ভিদের নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে সুবিধা হয়।

৩। নতুন প্রকরণ সৃষ্টি হতে পারে।

৪। আমাদের খাদ্য দানা, তৈলবীজ ইত্যাদি এর মাধ্যমে পেয়ে থাকি।

২। অযৌন প্রজনন (Asexual reproduction) : পুং ও স্ত্রীগ্যামিটের মিলন ছাড়া উদ্ভিদের যে প্রজনন ঘটে তাকে অযৌন প্রজনন বলে। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে অযৌন স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। আবৃতবীজী উদ্ভিদ সাধারণত দেহ অঙ্গের মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-

(a) অযৌন স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে : নিম্নশ্রেণির বেশকিছু উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের রেণু বা স্পোর (spore) তৈরি হয়। এসব স্পোর অঙ্কুরিত হলে নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়। অনুকূল পরিবেশে এসব স্পোরে মাইটোসিস বিভাজন ঘটে নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়।

...বিশেষের তারতম্যে অধিকাংশ ছত্রাক ও শৈবাল বিভিন্ন প্রকার স্পোর গঠন করে। এদের মধ্যে পেনিসিলিয়ামের ...(conidia) বা কনিডিওস্পোর (conidiospore), ...স্পোরানজিওস্পোর (sporangiospore) বা গনিডিয়া (...gonidia), অ্যাগারিকাসের বেসিডিওস্পোর (basidiospore) ...ভাবে উল্লেখযোগ্য।

...শৈবালের মধ্যে ক্ল্যামাইডোমোনাস চলরেণু বা ...(zoospore) এবং স্থিররেণু (resting spore) বা ...(akinete) এবং অন্যান্য বহু শৈবালের স্থূল প্রকারাবদ্ধ ...স্পোর (aplanospore) ইত্যাদি হলো বিভিন্ন ধরনের ... স্পোর। এছাড়া ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটাভুক্ত ...রেণুথলিতে (sporangium) উৎপন্ন রেণুগুলো অযৌন ...বংশবিস্তারে সহায়ক। ফার্ন (fern) ও লাইকোপোডিয়াম (*Lycopodium*)-এর স্পোর সম-আকৃতির অর্থাৎ হোমোস্পোরাস (homosporous), কিন্তু সেলাজিনেলা (*Selaginella*), শুশনি শাক (*Marsilea*) ইত্যাদির স্পোর অসম-আকৃতির অর্থাৎ হেটারোস্পোরাস (heterosporous)।

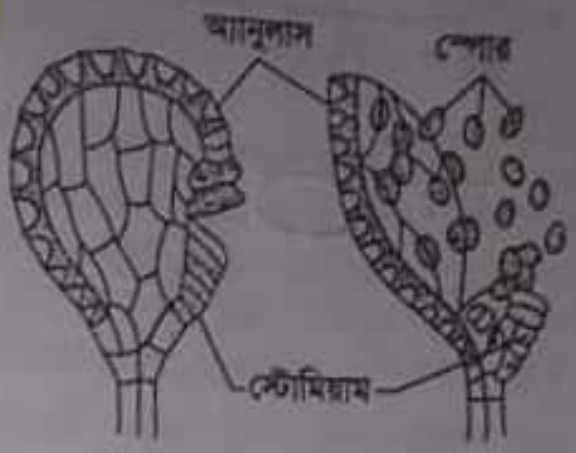

চিত্র ১০.৮ : ফার্নের স্পোরাঞ্জিয়াম (বাঁয়ে) ও এর বিদারণ (ডানে)

(b) দেহ অঙ্গের মাধ্যমে : আবৃতবীজী উদ্ভিদে দেহ অঙ্গের মাধ্যমে অযৌন প্রজনন হয়ে থাকে। এরূপ জননকে অঙ্গজ প্রজনন (vegetative reproduction) বলা হয়। অন্যভাবে, দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষ নতুন জীব সৃষ্টি করলে তাকে অঙ্গজ প্রজনন বলে। প্রকৃতিতে অনেক উদ্ভিদে স্বাভাবিকভাবেই অঙ্গজ প্রজনন হয়ে থাকে। আবার কৃত্রিম উপায়েও অঙ্গজ প্রজনন করা হয়। নিচে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গজ প্রজনন সম্বন্ধে বর্ণনা করা হলো :

(ক) উদ্ভিদের স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন : নিম্নলিখিত উপায়ে স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন ঘটতে পারে।

(i) মূল দ্বারা (By roots) : মিষ্টি আলু, ডালিয়া, শতমূলী, কাঁকরোল, পটল প্রভৃতি উদ্ভিদের মূল থেকেই নতুন গাছের ...হয়। জমিতে এদের মূল লাগানো হয়।

(ii) কাণ্ড দ্বারা (By stem) : আলু, আদা, পিঁয়াজ, সটি, ওলকচু প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ড থেকেই নতুন উদ্ভিদের জন্ম ...। ...পুদিনা, আনারস, চন্দ্রমল্লিকা, বাঁশ এগুলোর সাকার-এর (বিশেষ কাণ্ড) সাহায্যে প্রজনন হয়।

চিত্র ১০.৯ : কয়েকটি উদ্ভিদের স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন অঙ্গ।

(iii) **পাতার মাধ্যমে** (By leaf) : পাথরকুচি পাতা মাটিতে ফেলে রাখলেই একটি পাতা থেকে বহু নতুন গাছের জন্ম হয়। এগুলোই হলো স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন-এর উদাহরণ।

(iv) **বুলবিল বা কক্ষমুকুল** : কোনো কোনো উদ্ভিদে পরিবর্তিত কক্ষমুকুল তথা বুলবিল দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ঘটে। যেমন- চুপরিআলু।

(v) **অর্থ বায়বীয় কাণ্ড দ্বারা** : কচু জাতীয় উদ্ভিদে অর্থ বায়বীয় কাণ্ড (রানার বা লতি হিসেবে পরিচিত) দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ঘটে। আমরুল শাকের স্টোলন দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ঘটে।

(vi) **মুকুলোদগম** (Budding) : ঈস্ট নামক এককোষী ছত্রাকের মাতৃকোষ থেকে এক বা একাধিক মুকুল সৃষ্টি হয়। মুকুলগুলো মাতৃকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন ঈস্টের জন্ম দেয়।

(vii) **পর্ণকাণ্ড দ্বারা** : ফণিমনসার পর্ণকাণ্ড থেকে নতুন গাছ হয়।

(খ) **উদ্ভিদের কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন** : উদ্ভিদের কোনো দৈহিক অঙ্গ যেমন-মূল, কাণ্ড, পাতা ইত্যাদির সাহায্যে বংশবিস্তার করার প্রক্রিয়াকে কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন বলে। কৃত্রিম পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফুল ও ফলের গুণগতমান বজায় রেখে এ ধরনের জনন ঘটানো হয়। যে পদ্ধতিতে এটি সম্ভব তাকে কলম করা বলে। কলম নিম্নলিখিত উপায়ে করা হয়ে থাকে।

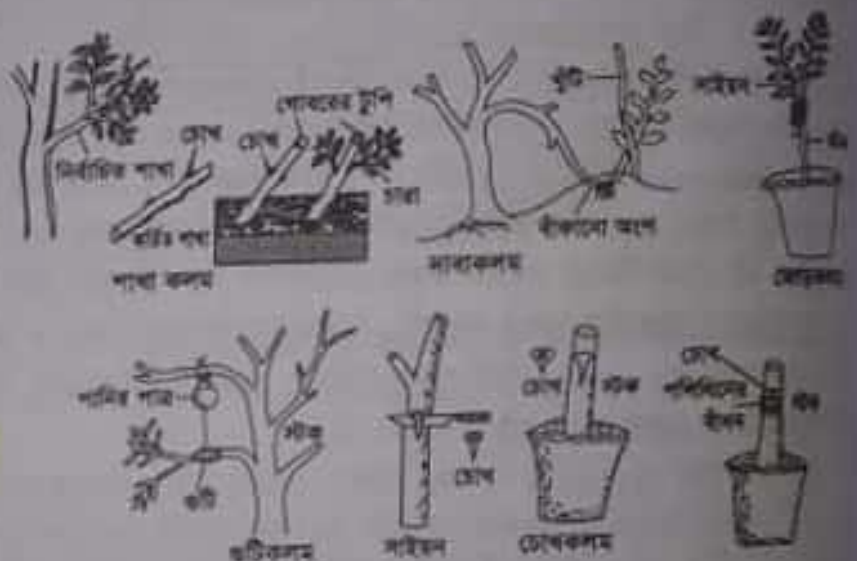

চিত্র ১০.১০ : কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন। (কলম করার বিভিন্ন পদ্ধতি)।

(i) **শাখা কলম বা কাটিং** (Cutting) : জবা, আখ, গোলাপ, পাতাবাহার, সজিনা, আপেল, কমলালেবু ইত্যাদি গাছের পরিণত কাণ্ডের অংশবিশেষ কেটে সিক্ত বা ভিজে মাটিতে পুঁতলে তা থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়।

(ii) **দাবা কলম** (Layering) : লেবু, যুঁই প্রভৃতি গাছের মাটি সংলগ্ন লম্বা শাখাকে বাঁকিয়ে মাটিতে চাপা দিলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মাটির মধ্যে অবস্থিত শাখাটির পর্ব থেকে অস্থানিক মূল নির্গত হয়। মাটিতে চাপা পড়া অংশের বাকল (ছাল) কেটে দিলে সেখানে দ্রুত মূল গজায়। মূলসহ শাখাটি কেটে অন্য জায়গায় লাগালে নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়।

(iii) **জোড়কলম** (Grafting) : বিভিন্ন ফল ও ফুল গাছের উন্নতজাত বজায় রাখার জন্য জোড়কলম তৈরি করা হয়। নির্বাচিত উদ্ভিদের কোনো শাখা টবে লাগানো অন্য একটি উদ্ভিদের সাথে জুড়ে দিতে হয়। বিচ্ছিন্ন অংশটিকে সাইয়ন (scion) বলে এবং সাইয়নকে যে উদ্ভিদের সাথে জোড়া দেয়া হয় তাকে স্টক (stock) বলে। স্টক যে কোনো ধরনের নিম্নমানের উদ্ভিদ হতে পারে। মাটির রস শোষণ করে উপরে পাঠানোই স্টকের কাজ। অন্যদিকে সাইয়ন সাধারণত ইচ্ছা জাতের উদ্ভিদের অংশ হয়ে থাকে। সুতরাং ফল ও ফুলের চরিত্র নির্ভর করে সাইয়নের উপর, স্টকের উপর নয়।

(iv) **গুটিকলম** (Gootee) : শক্ত কাণ্ডযুক্ত যে কোনো ফল গাছ, যেমন- লেবু, আম প্রভৃতি বা গোলাপ, পদ্ম প্রভৃতি ফুলের গাছে গুটিকলম তৈরি করা যায়। গুটিকলমের জন্য নির্বাচিত অংশের বাকল (ছাল) ছাড়িয়ে সেখানে গোবর মাটি ও খড় দিয়ে ঢেকে শক্ত করে দড়ি বেঁধে দিতে হয়। নিয়মিত সেখানে পানি দিতে থাকলে ঐ অংশে কিছুদিন পর অস্থানিক মূল গজায়। মূলসহ শাখাটি বিচ্ছিন্ন করে ভিজে মাটিতে অন্যত্র রোপণ করলে তা থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়।

(v) **চোখকলম বা কুঁড়ি সংযোজন** (Budding) : এ পদ্ধতিতে একটি গাছের কাণ্ডে অন্য গাছের কাঙ্ক্ষিত মুকুল সংযুক্ত করা হয়। যে গাছের কাণ্ডে মুকুল সংযোজন করা হবে তার সুবিধা মতো শাখায় ছুরি (নাইফ) দিয়ে T-আকারে বাকল কেটে নিয়ে সেই স্থানে কাঙ্ক্ষিত গাছের একটি মুকুল (অনুরূপ আকারে) নিয়ে বায়ুরোধী করে বেঁধে দেয়া হয়। কয়েক দিনে

...মুকুলটি মাতৃ গাছের সাথে সংযুক্ত হয় এবং দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে নতুন শাখা উৎপন্ন করে। যেমন- কুল (বরই), ...গাছে এ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

...র্থক কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজননের জন্য চাই অভিজ্ঞতা, চাই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কিছু রাসায়নিক পদার্থ (মূল তৈরির ...), মোম ইত্যাদি।

৩। পারথেনোজেনেসিস (Parthenogenesis) বা অপুংজনি : উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদে সাধারণত ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর ...মিলন তথা নিষেকের ফলে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডিম্বাণু নিষিক্ত না হয়ে সরাসরি ভ্রূণ সৃষ্টি করে ...কে। যে প্রজনন প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণুটি নিষেক ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টি করে এবং ডিম্বক স্বাভাবিক বীজে পরিণত হয় তাকে পারথেনোজেনেসিস বা অপুংজনি বলে। হরমোন প্রয়োগে বীজহীন ফল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে পারথেনোকার্পি (parthenocarpy) বলে। উদাহরণ- লেবু, কমলালেবু প্রভৃতি।

পারথেনোজেনেসিস প্রধানত দু'প্রকার। যথা: (i) হ্যাপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস এবং (ii) ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস।

(i) হ্যাপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস (Haploid Parthenogenesis) : যখন স্বাভাবিক মায়োসিস প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু সৃষ্টি ...হলেও তা নিষিক্ত না হয়ে সরাসরি ভ্রূণের সৃষ্টি করে তখন তাকে হ্যাপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস বলে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদও হ্যাপ্লয়েড হয় এবং অনুর্বর হয়। *Solanum nigrum, Orchis maculata* উদ্ভিদে অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।

(ii) ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস (Diploid Parthenogenesis) : যখন স্বাভাবিক মায়োসিস প্রক্রিয়ার বদলে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু (2n) সৃষ্টি হয় এবং পরে ভ্রূণে পরিণত হয় তাকে ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস বলে। *Parthenium argentatum* ও *Taraxacum albidum* উদ্ভিদে ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস হতে দেখা যায়।

Nicotiana tabacum (তামাক) এ অনিষিক্ত শুক্রাণু হতে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। নিষেকক্রিয়া ছাড়া শুক্রাণু থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অ্যান্ড্রোজেনেসিস (androgenesis) বলে।

কৃত্রিম পারথেনোজেনেসিস : বাহ্যিক আবেশের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে বহু উদ্ভিদে পারথেনোজেনেসিস ঘটানো সম্ভব। ...গ্যামিট ডিম্বাণুতে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এরূপ উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী পদার্থ প্রয়োগ করে নিষেক ছাড়াই ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ উৎপন্ন করা হয়। এক্স-রে প্রয়োগে, ইমাস্কুলেশনের পর পরাগায়ন বিলম্বিত করে বা বেলডিটোন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে পারথেনোজেনেসিস ঘটানো সম্ভব।

পারথেনোজেনেসিস-এর গুরুত্ব : উদ্ভিদের প্রজননে পারথেনোজেনেসিস তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেসব উদ্ভিদে তাদের স্বাভাবিক প্রজনন পারথেনোজেনেসিস হতে দেখা যায় (যেমন- *Solanum nigrum, Parthenium argentatum*) ...যৌন প্রকার।

- কোন উদ্ভিদে অযৌন বা যৌন পদ্ধতিতে প্রজনন না ঘটে কেবল পারথেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় নতুন উদ্ভিদের জন্ম হলে ঐ উদ্ভিদের জন্য এ প্রক্রিয়াটি অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বন্ধ্যাত্বের হাত থেকে বা বিলুপ্তির হাত থেকে প্রজাতিটি রক্ষা পায়।
- এ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকরণ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না।
- এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সুবিধাজনক মিউট্যান্ট বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটতে পারে।
- এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ ব্রিডিং গবেষণায় কাজে লাগানো যায়।

অ্যাপোস্পোরি (Apospory) : ডিম্বকের (ovule) যে কোনো দেহকোষ থেকে (যেমন- ডিম্বক ত্বক, নিউসেলাস) ডিপ্লয়েড ভ্রূণথলি (embryo sac) সৃষ্টি হতে পারে। ডিম্বকের দেহকোষ থেকে সৃষ্ট ডিপ্লয়েড ভ্রূণথলির ডিপ্লয়েড ডিম্বাণুটি ...তে নিষেক ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় অ্যাপোস্পোরি। অ্যাপোস্পোরি প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদ ডিপ্লয়েড হয় এবং ...তৃ উদ্ভিদের সমগুণসম্পন্ন হয়। *Hieracium* উদ্ভিদে এরূপ হতে দেখা যায়।

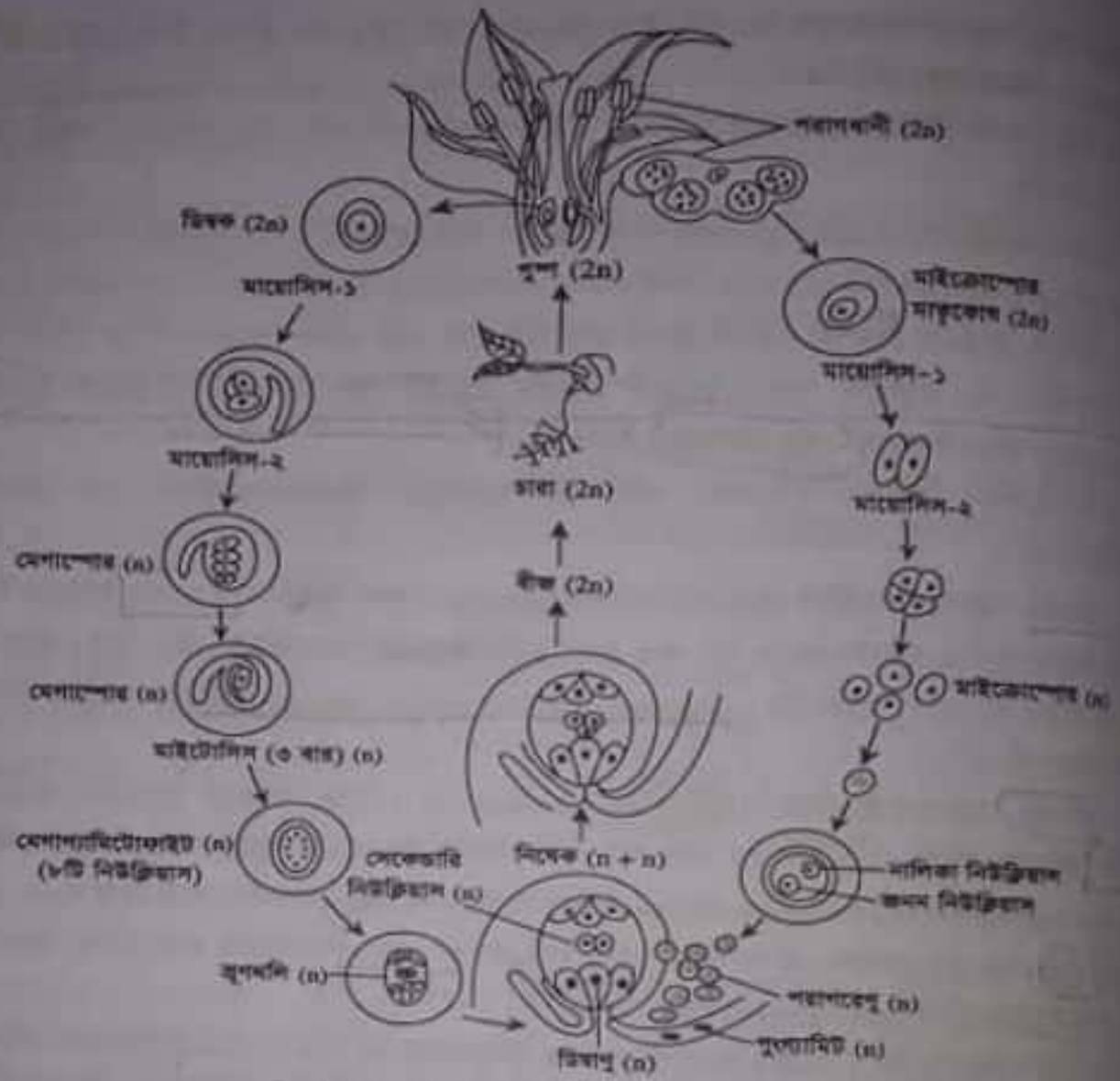

চিত্র ১০.১১ : আবৃতবীজী উদ্ভিদের জীবন চক্রে জনুক্রম।

ডিম্বকের ডিম্বক ত্বক বা নিউসেলাসের যে কোনো কোষ হতে ভ্রূণথলি গঠন ছাড়াই (অ্যাপোস্পোরিতে ভ্রূণথলি গঠিত হয়) ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি (adventitive embryony)।

অ্যাপোগ্যামি (Apogamy) : ডিম্বাণু ছাড়া ভ্রূণথলির অন্য যে কোনো কোষ (যেমন- সহকারি কোষ, প্রতিপাদকোষ ইত্যাদি) থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অ্যাপোগ্যামি বলে। এক্ষেত্রে নিষেক ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। *Allium*-এ এরূপ লক্ষ্য করা যায়।

পারথেনোজেনেসিস, অ্যাপোস্পোরি, অ্যাপোগ্যামি এবং অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি এর প্রতিটি প্রক্রিয়াতেই নিষেক ছাড়া ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। ডিম্বাণু, ভ্রূণথলি বা ডিম্বকের অন্যান্য কোষ থেকে নিষেক ছাড়া ভ্রূণ তৈরির এসব প্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় অ্যাগামোস্পার্মি (agamospermy)। অ্যাগামোস্পার্মি অণুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য পরাগায়ন আবশ্যক হলে তাকে বলা হয় সিউডোগ্যামি (Pseudogamy)। শাঁস তৈরির জন্যই পরাগায়নের প্রয়োজন হয়, ভ্রূণ তৈরির জন্য নয়।

অযৌন জনন	যৌন জনন
১। গ্যামিট সৃষ্টি হয় না এবং গ্যামিটের প্রয়োজন হয় না।	১। গ্যামিট সৃষ্টি হয় এবং দুটি বিপরীতধর্মী গ্যামিটের মিলন ঘটে।
২। মায়োসিস কোষবিভাজনের প্রয়োজন হয় না।	২। মায়োসিস কোষবিভাজনের প্রয়োজন হয়।
৩। সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় না।	৩। সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদে বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়।
৪। সৃষ্ট উদ্ভিদ কম অভিযোজনক্ষম হয়।	৪। সৃষ্ট উদ্ভিদ অধিক অভিযোজনক্ষম হয়।
৫। সাধারণত নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে ঘটে।	৫। নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদে ঘটে।

উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন (Artificial Reproduction of Plants)

বর্তমানে প্রচলিত ফসল হতে আরো উন্নত বৈশিষ্ট্যের নতুন প্রকরণ উদ্ভাবন প্রক্রিয়াকে সাধারণভাবে ব্রিডিং (breeding) বলা হয়। নির্বাচন (selection), সংকরায়ন (hybridization), মিউটেশন (mutation) ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে ফসলের উন্নত নতুন জাত উদ্ভাবন করা যায়। দুটি বিপরীত নির্বাচিত উদ্ভিদের মধ্যে যেখানে প্রাকৃতিক উপায়ে পরাগায়ন ও প্রজনন ঘটানো সম্ভব সেখানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরাগায়ন ঘটিয়ে উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধন করে উন্নত জাত বা প্রকরণ সৃষ্টি করাকে উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন বলে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদকে সংকর (hybrid) উদ্ভিদ বলা হয়। উন্নত-নতুন ফসল সৃষ্টি প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে হাইব্রিডাইজেশন (hybridization) তথা সংকরায়ন অন্যতম। প্রকৃতিতে প্রাকৃতিকভাবেও কিছু কিছু হাইব্রিডাইজেশন ঘটে থাকে, তবে সাধারণত কৃত্রিম উপায়েই হাইব্রিডাইজেশন ঘটানো হয়। সংকরায়ন হলো উদ্ভিদ সুপ্রজননের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে এক বা একাধিক জিনগত বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন দুই বা ততোধিক উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করিয়ে নতুন ভ্যারাইটি (জাত) উদ্ভাবন করা হয়।

ভিন্নতর জেনেটিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত দুই বা ততোধিক উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস (cross) করানোর প্রক্রিয়াকে বলা হয় কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশন (artificial hybridization)। সাধারণত উন্নত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত নতুন প্রকরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এটি করা হয়।

কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশন (সংকরায়ন) প্রক্রিয়া বা কৌশল : কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশন প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

১। **প্যারেন্ট নির্বাচন :** কাদের মধ্যে হাইব্রিডাইজেশন করতে হবে তা নির্বাচন করাই হলো প্যারেন্ট নির্বাচন।

২। **প্যারেন্টের কৃত্রিম স্বপরাগায়ন :** প্যারেন্ট স্বপরাগী না হলে এদেরকে কৃত্রিম স্বপরাগায়নের মাধ্যমে হোমোজাইগাস (homozygous) করা হয়।

৩। **প্যারেন্ট উদ্ভিদের ইমাস্কুলেশন :** যে পুষ্পকে মাতৃপুষ্প হিসেবে ধরা হবে তা যদি উভলিঙ্গ (এবং স্বপরাগী হয় অথবা প্রয়োজনে স্বপরাগী হতে পারে) হয় তাহলে ইমাস্কুলেশন করা হয়। পরিপক্ব হবার আগেই পুষ্প থেকে পুংকেশর মেরে ফেলা বা সরিয়ে ফেলাকে বলা হয় ইমাস্কুলেশন। এতে করে স্বপরাগায়ন ঘটতে পারে না

৪। **ব্যাগিং :** পলিথিন ব্যাগের সাহায্যে ক্রসে ব্যবহারের জন্য নির্বাচিত উদ্ভিদের পুষ্পিত অংশকে ঢেকে দেওয়া হয়।

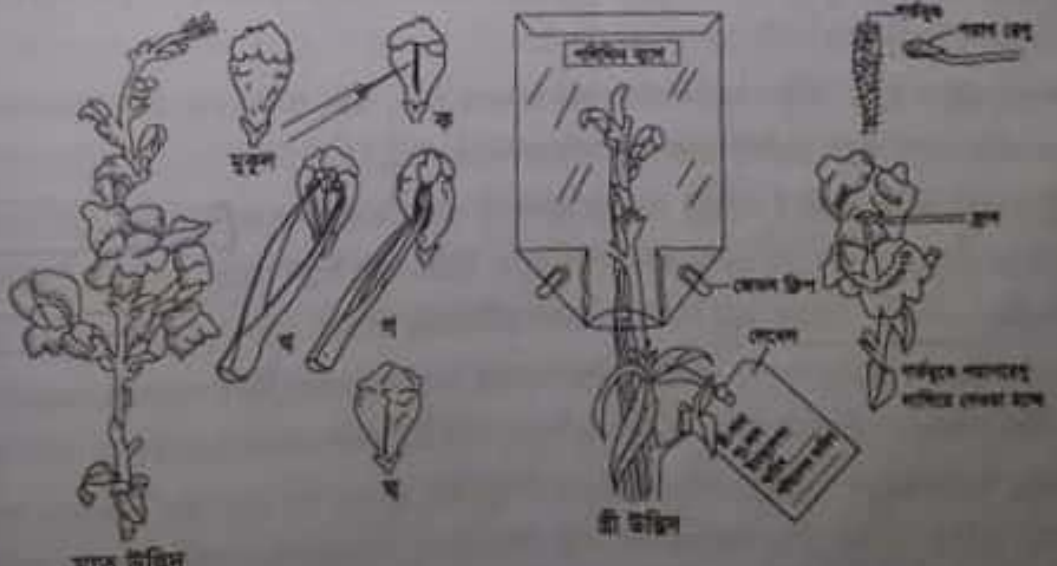

চিত্র ১০.১২ : ক্রসিং-এর বিভিন্ন পর্যায় (ক-ঘ ইমাস্কুলেশন) বা সংকরায়ন।

৫। ক্রসিং : ব্যাগিং করা পুং উদ্ভিদ হতে পুংরেণু সংগ্রহ করে ব্যাগিং করা স্ত্রী উদ্ভিদের ইমাস্কুলেটেড পুষ্পের গর্ভ ফেলা হয়।

৬। লেবেলিং : ইমাস্কুলেশনের তারিখ, ক্রসিং-এর তারিখ, মাতৃ ও পিতৃ উদ্ভিদ পরিচিতি সম্বলিত একটি লেবেল উদ্ভিদে লাগিয়ে দেয়া হয়।

৭। বীজ সংগ্রহ : কৃত্রিম পরাগায়নের ফলে সৃষ্ট ফলটি পাকলে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

৮। বীজ বপন ও F_1 উদ্ভিদের উদ্ভব : পরবর্তী বছর কৃত্রিম ক্রসের ফলে সৃষ্ট বীজগুলো বপন করা হয় এবং F_1 বংশধর সৃষ্টি হয়। F_1-বংশধরগুলো হলো নির্বাচিত প্যারেন্টের হাইব্রিড। পরে F_2 .....F_6 পর্যন্ত বংশধর সৃষ্টি করে উন্নত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নতুন প্রকরণ সৃষ্টি করা হয়।

৯। F_1 বংশধরের ব্যবহার ও নতুন প্রকরণ সৃষ্টি : F_1 বংশধরের দুটি উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করিয়ে যেসব উদ্ভিদের বীজ হয় সেগুলো হলো F_2 বংশধর। একই পদ্ধতিতে কয়েক প্রজন্ম (generation) ধরে এভাবে সংকরায়ন করতে করতে এবং নতুন প্রকরণ এর জন্ম হয়।

প্রকৃতপক্ষে ৩ হতে ৬ নম্বর ধারাকে মিলিতভাবে কৃত্রিম প্রজননের কলাকৌশল বলা হয়।

সংকরায়ন পদ্ধতির সতর্কতা (Precaution)

১। প্যারেন্ট নির্বাচন করার সময় তাদের পার্থক্যগুলো সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করতে হয়।

২। ইমাস্কুলেশন ও পরাগায়নের সময় হাত, সূঁচ, চিমটা, তুলি প্রভৃতি স্পিরিট দিয়ে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হয়।

৩। লক্ষ্য রাখতে হবে, ইমাস্কুলেশনের সময় যেন একটি পুংকেশরও থেকে না যায় এবং গর্ভকেশরের যেন কোন ক্ষতি না হয়।

৪। ব্যাগিং ঠিকমতো করতে হবে এবং এর মধ্যে বায়ু প্রবেশের জন্য সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকতে হবে।

৫। সংকর বীজ সংগ্রহ এবং এক্ষেত্রে কলা-কৌশল গ্রহণ সঠিকভাবে নিতে হবে।

বিবর্তনে কৃত্রিম প্রজননের ভূমিকা

উদ্ভিদ বিবর্তনে কৃত্রিম প্রজননের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে কৃত্রিম প্রজননের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

ভ্যারিয়েশন সৃষ্টি : বিবর্তনের আধুনিক ধারণা মতে মিউটেশন, ক্রোমোসোমীয় মিউটেশন, জেনেটিক রিকম্বিনেশন প্রজাতি বৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফলে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত গুণসম্পন্ন নতুন নতুন প্রজাতি তৈরি হয় যার মাধ্যমে ভ্যারিয়েশন (বৈচিত্র্যের) সৃষ্টি হয়।

প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত তৈরি : কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা প্রতিরোধক্ষম জাত তৈরি করা যায়। এ জাত নতুন পরিবেশের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরি : শস্যের সর্বোচ্চ ফলনের প্রধান সমস্যা হলো রোগ ও কীট পতঙ্গের আক্রমণ। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমের বিভিন্ন ফসলের রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। BRRI উদ্ভাবিত মুক্তা (বিআর-১০), গাজী (বিআর-১৪) মোহিনী (বিআর-১৫)। এগুলো রোগ প্রতিরোধী জাত।

গুণগত মান উন্নয়ন : খাদ্য শস্যের ক্ষেত্রে দানার আকার, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, দীর্ঘ সংরক্ষণ সময় ইত্যাদি উন্নত বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এসব বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর করে উদ্ভিদের গুণগত মান উন্নয়ন করা যায়।

আবাদকাল সংক্ষিপ্তকরণ : বন্যার কারণে অনেক নিম্নভূমির আবাদ নষ্ট হয়ে যায়। আবার খড়ে পোকোপেও অনেক ফসল নষ্ট হয়। কৃত্রিম সংকরায়নের মাধ্যমে ফসলের আবাদকাল ২০-৩০ দিন পর্যন্ত কমানো সম্ভব। এতে বন্যার পূর্বেই ফসল সংগ্রহ করা যাবে।

কৃত্রিম প্রজননের অর্থনৈতিক গুরুত্ব : কৃত্রিম প্রজননের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে ফসলের অসংখ্য উন্নত ফলনশীল জাত। উন্নত ফলনশীল প্রকরণগুলোর অধিকাংশই আবার রোগ ও খরা প্রতিরোধক্ষম। প্রতি বছর পৃথিবীতে উন্নত ফলনশীল প্রকরণগুলোর কারণে লক্ষ লক্ষ টন ফলন বেড়ে চলেছে। সংক্ষিপ্ত আকারে কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব নিম্নরূপ :

(১) উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন, (২) রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবন, (৩) প্রতিকূল পরিবেশে অভিযোজনক্ষম জাত উদ্ভাবন, (৪) উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড উদ্ভাবন, (৫) দৃষ্টিনন্দন অর্কিড উদ্ভাবন, (৬) দৃষ্টিনন্দন গোলাপ উদ্ভাবন, (৭) নতুন প্রজাতি উদ্ভাবন (৮) বীজহীন ফলের জাত উদ্ভাবন, (৯) অধিক ফলনশীল শাক-সবজির জাত উদ্ভাবন এবং (১০) প্রাণির কৃত্রিম প্রজননে বহু উন্নত জাত উদ্ভাবন। নিম্নে কৃত্রিম প্রজননের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো :

❑ **উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত সৃষ্টি :** ১৯৬০ এর দশকে ফিলিপিনমে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রের (IRRI-International Rice Research Institute) বিজ্ঞানিগণ ইরি ধান উদ্ভাবন করেন। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ধান ইরি-২০, ইরি-৮, ইরি-৫, ইরি-২৮, ইরি-২৯ ইত্যাদি। একরপ্রতি এদের ফলন বেড়েছে বহুগুণ। বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্রে (BRRI-Bangladesh Rice Research Institute) উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ধান চান্দিনা, বিরিশাইল, ইরিশাইল ইত্যাদির ফলনও অনেক বেশি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত চারটি উফশী জাতের নাম হলো- চান্দিনা (বিআর-১), মালা (বিআর-২), শাহী বালাম (বিআর-১৫) এবং শ্রাবনী (বিআর-২৬)। গত ৪০ বছরে এশিয়ায় ধানের উৎপাদন কমপক্ষে ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধিক ফলনশীল ইরি বা বিরি ধান উদ্ভাবনের আগে পৃথিবীর এ অঞ্চলে, বিশেষ করে আজকের বাংলাদেশ অঞ্চলে বছর বছর পর পরই দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো, অথচ তখন লোকসংখ্যা ছিল আজকের তুলনায় অনেক কম এবং ধান চাষের জমিও ছিল অনেক বেশি। এর প্রধান কারণ হলো তখন ধানের ফলন একরপ্রতি খুবই কম ছিল, ফলে কোনো বছর আগাম বন্যা বা খরা দেখা দিলেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো। তখনকার সময়ে চাষকৃত জাতগুলোর একরপ্রতি সর্বাধিক ফলন ছিল ৩০-৩৫ মণ। বর্তমানে চাষকৃত উচ্চফলনশীল জাতের একরপ্রতি সর্বাধিক ফলন হয় ৭০-৯০ মণ।

ইরি-৮, ইরি-৫, ইরিশাইল এগুলো উচ্চফলনশীল ধানের জাত। ইন্দোনেশিয়ান পেটাধান ও তাইওয়ানের ডি. জি. উজেন ধানের মধ্যে সংকরায়ন করে উদ্ভাবন করা হয়েছে ইরি-৮। এর একরপ্রতি ফলন ৯০-১০০ মণ। ইরি-৫ উদ্ভাবন করা হয়েছে ইন্দোনেশিয়ান পেটা ধান ও টোংকোই ধান এর সংকর করে। ইরি-৫ এর ফলন একরপ্রতি ৭০-৭৫ মণ। বাংলাদেশে উদ্ভাবিত ইরিশাইল উদ্ভাবন করা হয়েছে ইন্দোনেশিয়ান পেটাধান, ভারতের টি. কে. এম-৬ ধান এবং তাইওয়ানের টাইচুং-১ এর মধ্যে সংকর করে। এর একরপ্রতি ফলন ৭০-৭৫ মণ। এমনিভাবে বিআর-২০ এবং বিআর-৩ এর মধ্যে সংকরায়ন করে উদ্ভাবন করা হয়েছে বিরিশাইল। বিআর-২৮ এবং ২৯ আরও উন্নত জাত।

❑ **উচ্চ ফলনশীল গমের জাত তৈরি :** বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চাষকৃত গমও কৃত্রিম প্রজননের ফসল। আগে গমের ফলন ছিল খুবই কম। তাছাড়া বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায়ই ফসল নষ্ট হয়ে যেতো। ফসল রক্ষার জন্য তখন লক্ষ লক্ষ টাকার ওষুধ প্রয়োগ করতে হতো। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বর্তমান গমের ফলনও বেশি। আবার রোগ প্রতিরোধক্ষম হওয়ায় ওষুধ প্রয়োগের তেমন প্রয়োজন হয় না। এর ফলে খরচ কম হয়, অথচ ফসল বেশি পাওয়া যায়।

অনেক আগে যে গমের চাষ হতো তার ফলন ছিল খুবই কম, তাছাড়া এর রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও ছিল কম। বিভিন্ন জাতের মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে উন্নতজাতের গম, যা বর্তমানে চাষ করা হয় বিশ্বব্যাপী। মেক্সিকোর (CIMMIT) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) ১৭ জাতের উফশী গম উদ্ভাবন করেছে। এসব জাতের মধ্যে বলাকা, কাঞ্চন, আনন্দ, আকবর, বরকত ও সওগাত বেশ জনপ্রিয় জাত। উচ্চফলনশীল গম উদ্ভাবনের জন্য আমেরিকান বিজ্ঞানী Norman Earnest Borlaug ১৯৭০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

□ **উন্নত জাতের ভুট্টা উৎপাদন :** আমেরিকার বিজ্ঞানী G. H. Shull ১৯০৮ সালে ভুট্টার সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টি করে ভুট্টার দানা উৎপাদনে দারুণভাবে সফল হন। এরপর ভুট্টার দ্বি-সংকর পদ্ধতিতে এর উৎপাদন আরও বাড়ানো হয়েছে।

□ **উন্নত জাতের ফুল ও অর্কিড উৎপাদন :** বর্তমান সময়ে চাষকৃত অধিকাংশ ফুলই সংকরায়নের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতি বছর বহু অর্কিড সৃষ্টি করা হচ্ছে সংকরায়নের মাধ্যমে। কৃত্রিম সংকরায়নের মাধ্যমে যে জাত তৈরি হচ্ছে তার ফলে ফুল চাষে বিপ্লব ঘটছে। যেমন- গোলাপের হাইব্রিড-টি, ক্লোরিবান্ডা, মেরিগোল্ড, গ্লাডিওলাস, রজনীগন্ধা ইত্যাদি প্রায় সব জাতই হাইব্রিড।

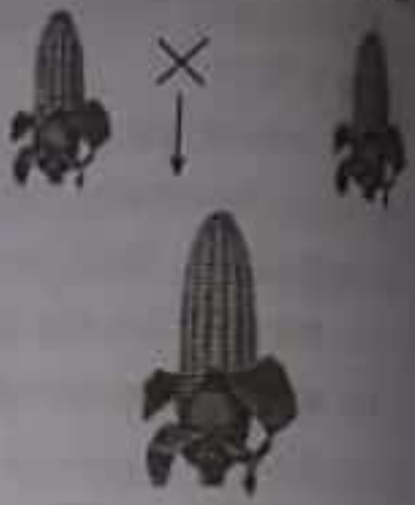

চিত্র ১০.১৩ : হাইব্রিড ভুট্টার সৃষ্টি

□ **হাইব্রিড ফল ও সবজি উৎপাদন :** কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশনের মাধ্যমে আম, তরমুজ, আপেল, বরই ইত্যাদি ফল এবং মিষ্টি কুমড়া, লাউ, টমেটো, ঝিঙা, বাঁধাকপি ইত্যাদি সবজি উৎপাদন করে বাজারজাত করা হচ্ছে। বীজহীন ফল ও সবজি কৃত্রিম প্রজননের সুফল।

□ **রোগ প্রতিরোধী জাত উৎপাদন :** বিভিন্ন রোগ সংক্রমণের ফলে প্রচুর পরিমাণে আবাদি ফসলের ফলনহানি হয়ে থাকে। বুনো প্রজাতির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় সংকরায়নের মাধ্যমে এ বৈশিষ্ট্য আবাদি জাতে কৃত্রিমভাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী জাত উৎপাদন করা সম্ভব। গাজী (BR-14), মুক্তা (BR-11), মোহিনী (BR-15) হচ্ছে ধানের রোগ প্রতিরোধী জাত।

এভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে কয়েক লক্ষ জাত বা প্রকরণ। ফলে সমৃদ্ধি ঘটেছে মানবসভ্যতার।

সার-সংক্ষেপ

প্রজনন : জীব থেকে নতুন শিশু জীব সৃষ্টি প্রক্রিয়াই প্রজনন। প্রজনন জীবের অনন্য বৈশিষ্ট্য। মাতৃউদ্ভিদ থেকে নতুন শিশু উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া হলো উদ্ভিদ প্রজনন। উদ্ভিদ বিভিন্ন উপায়ে প্রজনন করতে পারে। উপায়গুলো হলো অযৌন জনন, যৌন জনন, পারথেনোকার্পিক জনন। মূল ও কাণ্ডের বিভিন্ন উপবৃদ্ধি থেকে যে জনন হয় তা হলো অঙ্গজ জনন। ফুল সৃষ্টির মাধ্যমে যে প্রজনন হয় তা হলো যৌন প্রজনন। ফুল থেকে বীজ হয়, তাই বীজ দ্বারা যে প্রজনন হয় তা যৌন প্রজনন।

নিষেক : নিশ্চল স্ত্রীগ্যামিটের সাথে সচল পুংগ্যামিটের মিলনকে নিষেক বা নিষেকক্রিয়া বলা হয়। নিষেক ক্রিয়ার প্রথম ধাপ হলো পরাগায়ন। পরাগায়নের মাধ্যমে একই উদ্ভিদের অথবা একই প্রজাতির অন্য উদ্ভিদের পরাগধানী থেকে পরাগরেণু ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়। গর্ভমুণ্ডে পতিত হওয়ার পর পরাগরেণু পরাগনালিকা সৃষ্টির মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়। পরাগনালিকা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে গর্ভদণ্ড পার হয়ে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে। ইতোমধ্যে পরাগনালিকার ভেতরে শুক্রাণু সৃষ্টি হয়। পরাগনালিকা শেষ পর্যন্ত ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করে। শুক্রাণু ভ্রূণথলিস্থ ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে নিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। একই সময়ে অপর একটি শুক্রাণু ভ্রূণথলিতে অবস্থিত সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে দ্বিনিষেক সম্পন্ন করে। নিষেকের পর নিষিক্ত ডিম্বাণু পরিপূর্ণ হয়ে বীজে পরিণত হয়।

সংকরায়ন : কোনো ভালো বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গাছের পরাগরেণু একই প্রজাতির ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গাছের গর্ভমুণ্ডে পরাগায়ন ঘটিয়ে উন্নত জাত উদ্ভাবনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় সংকরায়ন (hybridization)। অন্যভাবে বলা যায়, সংকরায়ন হলো এমন প্রজনন পদ্ধতি যেখানে এক বা একাধিক জিনগত বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন দুই বা ততোধিক উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করিয়ে নতুন উন্নত ভ্যারাইটি (জাত) উদ্ভাবন করা হয়। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি করা হয়। ধানের ইরি বা বিভিন্ন উন্নত ফলনশীল প্রকরণ এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে।